বিপিনের সংসার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৮
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে চার টাকা

৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত হইল

বারাকপুর
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠি হাতে লম্বা চেহারার কে যেন হনহন করিয়া ওদের বাড়ির দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিন্সে এদিকে আসছে? বিপিন বলিল, জমিদারবাড়ির দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপর ডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক।

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধর আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি? বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দুদিন যে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি বাইশ দিন কি তার বেশি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমি ব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকট একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও—যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পার—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি!

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকু দিয়ে দিলাম।

বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই করে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন ক'রে খাবে?

—মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের ক'রে দিতে—তাই দিয়ে কর।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বল গিয়ে। বুড়ো মানুষ, দশমী আছে, দোয়াদশী আছে—ঐ তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজ রোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেই ভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি! বেশ সে পলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে, আর বাড়ি থাকিয়া লাভ কি? বাড়ির কেহই তেমন পছন্দ করে না যে, সে বাড়ি থাকে।

এমন সময় বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ি আছ হে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশে বলিল, কেষ্ট কাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃত সুর চড়াইয়া বলিল, আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।

কৃষ্ণলালের বয়স চুয়াল্লিশ বছর, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্দ্ধেক দাঁত পড়িয়া যাওয়ার দরুন, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কে এসেছিল হে, তোমার বাড়ি একজন খোট্টা মত?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে ব'সে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সে জন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে এক দিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্লাপ্ত লোক আসছে, ক্লাপ্ত লোক আসছে—ক্লাপ্ত টাকা পাঠাও টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হ'লে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব মশায়?

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে ব'লেই তো আরও মুস্কিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকার আমলে তা চলে না, কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছে সবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবার জন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নী ঘুন একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বল! পরের চাকরি করার তো কোন দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে ব'সে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে সুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বল?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শসার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়িতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া 'লিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে বসে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন; কি নেই?

—কিচ্ছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াসুরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে?

আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে প'ড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর···অকাট্য।

বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলার ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। বাড়ির এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, দিন রাত মনোরমার মধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি তো শুনিতে হইবে না? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল।

বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

২

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইল খানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ি কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু-আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি

বয়েস নয়—ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেক্রাইটিসের রুগী; অত্যন্ত ধরপাকড়ের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার বাড়ির সর্ব্বত্র অবাধগতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতালা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে করলে দুমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেই জন্যে কর্ত্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্ত্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া

খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও বুঝি নে! তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর যত্ন করব কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো বেগুন, থোড় কিংবা মোচা আর যদি পার ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকশব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এন আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এ সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনামূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া শুযিতেছে। এই সব জন্যেই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

৩

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ি ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে কানেস্তা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার পাঁচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙ্গা হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু, রাত্রে কি খাবা?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তে পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায় বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদাম গাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ

কাছারি-বাড়িতে এটি সখ করিয়া পুঁতিয়াছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিন্ বিন্ করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ি হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেনো দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল, তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ি লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনা যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুস্কিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে! যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়িতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে কতক গেল তাহারই বদ্‌খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরাজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে মাত্র। মনোরমা শ্বশুরবাড়ি আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া, স্বামীর সহিত সদ্ভাব জমিতে পাইল না যে; ইহাতে বিপিন মনে প্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই ?

—এই যে নায়েববাবু, কখন আলেন ? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ জাতিতে মুচি, শূওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুস্কিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো ? বাবুর জামাই মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে !

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া দাওয়া করুন, কাল বেন্‌বেলা আমি আসপো কাছারিতে—তখন হবে।

ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল।

নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্ত্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কডা দিন।

বিপিন সকালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের

টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এত দিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিন দিনের মধ্যে।

তিনটি দিন বাকি মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলেই মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাত মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বাবা তারে তুমি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার টাক্তার দেখাও—ওখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি—গিয়েছে তোমার উড়ঞ্চুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল। কম বিষয়ডা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ত্রুটীর উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড় হাত করলে না; আর একবার দিলাম কুড়ি টাকা পূজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম কুড়ি পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিল মাসীমা ব'লে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকা কড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত!

কামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। কদিন আছ এখানে?

—মঙ্গলবার সন্দেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসীমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ। টাকাটা যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হ'ত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বল!

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, পেঁপে পেকেছে সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। ধোপাখালির হাট হইতে জমিদার-গিন্নীর ফরমাসমত জিনিষপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষ রাত্রির দিকে গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌছিল।

জমিদার-বাড়ি পৌছিবার পূর্ব্বে শুনিল, জামাইবাবু কাল রাত্রে আসিয়া পৌছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই। জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে—পৈতৃক বাড়ি, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপোড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুর গাড়ি হইতে নামাইতে দেখিয়া জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! বড় কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা।

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ ক'রে না আনলেই হ'ত। মহল থেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাই বলতে রাইও তো কখনও দেখি নে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা। জমিদার-গিন্নী বিরক্ত মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলে আড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহলে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরি-তরকারি মাছে দু টাকার ওপর খরচ ক'রে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি?

বিপিন বলিল, দু টাকার ওপর কি বলছেন? সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেই এক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা ক'রে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি ওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ?

বিপিন খুশির সহিত ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ্ব'লে পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে। কি কঞ্জুষ আর কি ছোট নজর রে বাবা!

মুখে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বছর, একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড় লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড় লোকের জামাই, তা আমার কি?

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাস বিছানো চৌকির এক পাশে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না বা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্ব্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্ব্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাঁহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক করিয়া দিল, যখন সেই লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন? চিনতে পারেন? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি? নিন না, আমার কাছে আছে।

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য!

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছে আমার কাছে।—বলিয়া পকেট হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টা অপমানের অন্য কোন ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবুর ও কি সিগারেট? একটা এদিকে দিন দিকি!

বাড়ির গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে? বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্যও করে না; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু, কবে এলেন?

—কাল রাত্রে।

—বাড়ির সব ভাল তো?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন?

—হুঁ।

—বেশ বেশ। দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি?

—হুঁ

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বা খবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেন না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শহুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্য কোনও উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে স্থলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়, বা স্থলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও স্থলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজ নামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর স্থরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমই জানেন, কিন্তু জমিদার-বাড়ির মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী ব'লেই জানি কিনা। আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ি হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শহুরে জামাইবাবুর

চালবাজি সে ভাঙিয়া দিয়াছে। বিপিনকে এখনও চেনে নাই! চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহার সামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুণ বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছু খাবেন?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জ লোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে? ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরণ। সাধে কি সে এখানে থাকিতে নারাজ!

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরণের ব্যাপার অন্তরূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতের চারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিষই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিন বিকাল হইতেই খুশির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথা সে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নী তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন!

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নী বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব?

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচি আনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট। চক্ষুলজ্জা করিলে তাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নী আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়া

তাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে কখানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল, চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া। কারণ, ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নী ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব ?

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ব্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুস্কিলে পড়া গেল! লুচি দেব, লুচি দেব! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখে অমন বলার কি দরকার ?

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোন কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতে পারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসীমা, লুচি খাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হ'লে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

জমিদার-গিন্নী ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানালার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল-ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মত ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মত মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরণের একখানি রঙিন শাড়ি ও হাফ-

হাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটপৌরে সাজ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের স্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গে বাল্যকালে যেত আসিত এঁদের বাড়িতে, মানীর তখন নয় দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ব ও কুলের আচার চুরি করিয়া দুইজনে সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে, বিপিনের পৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়া দিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কত বড় হইয়া গিয়াছে! ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছো ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা ?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারে অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিক জন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। এক সময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে। তবে সে সব আজ ছয় সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ আটাশ।

বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী ?

—বিপিনদা, ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন ? আমি কি নতুন লোক এলাম ?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনো 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়া আসিয়াছে ; এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট মানীটি আছিস ?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনও দোষ নেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধর লেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায় আর আমি চিনি নে ? বিনোদকাকা যে রকম ক'রে কাজ ক'রে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কি তেমন পারবে ? আজই কি সব করেছ, দু তিন টাকা খরচ ক'রে দিয়েছ—মা বলছিলেন বাবাকে। বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই ক'রে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস্ এতকাল পরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুইই বা কি ভাববি ?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহল থেকে মাছ আনলে না কেন ?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোমাদের মহালে ? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছে নাকি ? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে। তোমার মা কি সে খবর রাখেন ?

—তা নয়, বিনোদকাকার মত ডানপিটে দুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমি ভাল মানুষ ধরণের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমত জমিদারি চালের কথাবার্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই, সংস্কৃত তো পড়নি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতীর মুণ্ডু খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াই নি কখনও। আচ্ছা, আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোন শোন, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয় আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল ক'রে শিখলে না? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর ক'রে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি ক'রে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম।

মানী বলিল, তা আর মনে নেই! সে সব এক দিন গিয়েছে! কিন্তু আমার কথা ওভাবে চাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বল?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ৎতলবকারিণী রে?

পরে ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই। তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস? বাবা মারা গেলেন বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা

রেখে। আমি তখন সবে আঠারোতে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউ নেই। টাকা উড়ুতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, পড়াশুনা ছাড়লাম, বিষয়-সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলাম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হ'লেও কোনও কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন? কিন্তু এখন বয়েস হয়ে বুঝেছি, কি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম তখন!

—তারপর?

—তারপর ওই যে বলছিলাম, নানা রকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দ্দশায়। খেতে পাই নে—এমন দশায় এসে পৌছুলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরণের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভালো লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না। মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এই রকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হ'ল আমার ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে?

—কি?

—আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বল ?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয় এবার বাড়ি থেকে আসতাম না। তবে যে কদিন তুই আছিস, সে কদিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছি নে।

—চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা। নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন। আমার কথা একটিবার রাখ বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখ। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমার ভালোর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি! এমন মূর্ত্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না মানী ?

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার !

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা। রাগ করিস নে।

—কথা দিলে ?

এই সময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রদ্দুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে! মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হ'লেই মেয়েরা সব ভুলে যায়!

বিপিনের পৌরুষগর্ব্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়া এমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহার সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল!

দুই তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাবপত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারী হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ির মধ্যে যায়, খাইয়া আসিয়াই কাছারি-বাড়িতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্ত্তা বেশি বলেন না। জমিদারি কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি!

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে-খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি কর। কিস্তির আর দেরি কি? এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরি না থাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমড়-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওড়ে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচ টাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বীরু হাড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবার ঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এস।

এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুর ছুটিতে হইবে। নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ি তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোন্ জমিদারিতে? ইহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক-পেয়াদার মধ্যে বীরু হাড়ী এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা খরচ ইঁহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ দুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজে বাহির হইতে পারে নাই। কোমড়-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

২

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ির মধ্যে। গিন্নীও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন ?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চার টাকা মোটে! বল কি ? এঃ, এর নাম আদায় ? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এস! মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁস-পব্ব আছে ? সেদিন বললাম ধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাৎলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনে হাজির!

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি পয়সায় মাছ আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরছে না মাসীমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই। বিপিন সামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সে অপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন, আর বার-বাড়িতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও।

ইঁহাদের বাড়িতে রাঁধুনি আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া গিন্নী নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনি নরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতে বসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে সে জানে, ইহারা কৃপণের একশেষ, জামাইয়ের জন্ত কোনও রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই! খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়িতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, কদিন দেখি নি?

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে? আজ পোলাও কেমন খেলে?

—বেশ।

—না, সত্যি বল না? ভাল হয়েছিল?

—কেন বল্ তো?

—আগে বল না, কেমন হয়েছিল?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে মনে আছে?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল। আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের ধাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্ন বিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমন যাই যাই করে না! হয়তো ঘুম পাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে।

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতে ঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্ব্বেও সে কিস্তির সময় কয়েক দিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন গোয়ালাবাড়ি, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়িতে অতিথি। বাড়ির সকলে হাতজোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারির মান থাকে? এমন হয়েছেন আমাদের জমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না। অথচ এই মহলে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয়; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়ে যাবে! ওরে বাবা রে!

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদার-বাড়ি ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছে অনাদিবাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা!

—এই যে মানী, কেমন? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসীমার মুখে?

মানী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কেন ব'লে গেলে আমার কাছে? তুমি পোলাও খেয়েছিলে সেদিন?

(মেয়ে মানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে; বাসী কাসুন্দি ঘাঁটা ওদের স্বভাব।) দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল! মানীর যেমন পাগলামি!

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন? খাই নি, তাতে কি?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝালো সুরে বলিয়া উঠিল, তাতে কিছু না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে? বললেই হ'ত, খাই নি। আমি তোমায় ফাঁসি দিতাম?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হ'ত? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত না?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছে এতে? শোন না, ও মানী!

কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ির দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান, যেমন মনোরমা, তেমনই মানী। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো? দোষটা কি আমার?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপর রাগ করিল? করাই বা যায় কি? মানী

তাহার প্রতি এতটা টানে, তাহা বিপিন কি জানিত? জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

৩

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ির মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে পোলাও দিই নি?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে?

—কেন বলুন তো?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিল দুজনে, তোমায় পোলাও দিই নি কেন, তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিই নি, বল তো বাবা?

—কেন দেবেন না? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে না মাসীমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অত শত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দু হাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না? কার মুখে কি শুনিস, আর তোর অমনই মহাভারতের মত বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়িতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি ক'রে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি পোলাও পাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে। বিপিন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদার-গৃহিণী যে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটিতে যাইবার সময় দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন হ'ল, বিপিনদা ?

—চমৎকার হয়েছে ! সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল ! খুব খাওয়া গেল ! কে রেঁধেছিল, তুই ?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বল না, কে ?

—তুই।

—ঠিক ধরেছ। তা হ'লে আজ খুশি তো ? মনে কোনও কষ্ট থাকে তো বল।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে ! তবে কষ্ট একটা আছে।

—কি, বল না ?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ ? আমার কি দোষ ছিল ?

মানী স্থির দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব ? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতে বললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স

থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি; শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে ?

—উঃ, সে কত কালের কথা ! তোর মনে আছে এখনও ?

মানী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে ! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পার ? তুমি দূরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ ।

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বল্যা হ'ত নয় কি ? ছেলেমানুষি ক'র না, অন্য কথা গোপনে আর একথা গোপনে তফাৎ নেই ?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যাই বলি, তাই শোন।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

৪

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ি থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই।

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যা-বেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জ্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারির ভৃত্যটি

রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকালে মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত।

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীরও ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার অনেক দিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে, মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালাপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্ত্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু

থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে ?

—উঃ, সে কত কালের কথা ! তোর মনে আছে এখনও ?

মানী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে ! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পার ? তুমি দূরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ ।

—ভুল কথা মানী । সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বলা হ'ত নয় কি ? ছেলেমানুষি ক'র না, অন্য কথা গোপনে আর একথা গোপনে তফাৎ নেই ?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ । এখন যাই বলি, তাই শোন ।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল ।

৪

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল ।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ি থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে ।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই ।

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যা-বেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে । ভারী নির্জ্জন বোধ হয় এই সময়টা । পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই । কাছারির ভৃত্যটি

রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকালে মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত।

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীরও ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার অনেক দিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে, মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালাপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্ত্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু

নায়েবকে ঘি যোগাড় করিবার ভার দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিন ঘানি-ভাঙা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদার-বাড়ি রওনা হইলেন। বিপিন যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াজিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে! তাহার বাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল! বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে, সে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানক অভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জ্জন করা তত সহজ নয়। টাকা যেখানে সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে বাবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হইল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকে চাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক

কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায় তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়ের সম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজার-খরচের জন্য নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও,—এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই হয়তো অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ী পলাশপুর হইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্তি করিয়াছে; সে আমোদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা দেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ অনেক দিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়িতে থাকিতে বাড়িতেই দুই বেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। দুরবস্থার উপরও বিপিন তাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট হয় নাই, জমিদারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মত।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি গোয়ালা জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর

এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই নির্জ্জন কাছারিঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটু গল্প-গুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদাম গাছটার পাতায় বাতাস লাগিয়া কেমন একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলেপাড়ার গদাধর পাড়ুইয়ের বাড়িতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণে রান্নাবাড়া সরিয়া বিপিন খাইতে বসে।

৫

এক একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়।

হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলে, খেতে বসে নাকি বাবা ?

—এস মাসী, এস। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আর রান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসী ? এস তুমি। বস এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চোকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলা বাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজ এবেলা ?

—আলুভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষে খেতে পারে? না খেয়ে-দেয়ে তোমার শরীর ঐরকম রোগাকাঠি। একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন ক'রে? তোমার বাবার আমলে দুধ-ঘিয়ের সোত ব'সে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ! তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসী বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্ত্তার মাঝখানে। সে কথা না উঠাইয়া বুড়ী যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসীর পক্ষে তাহা আর এতটুকু অগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ-বাতাসের রং অন্য রকমই ছিল, দুধ ঘি অপর্য্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের আমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসীর অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসী প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোনদিন বা একছড়া পাকা কলা খাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপন মনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়। সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতে হয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ি হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে ব'ল বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়িতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ি আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নবেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই

কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে? পাঁচ ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নয়। সে যাক, কিন্তু সেই চার পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ি এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ি যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতেই হইবে। সে পলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ি থেকে, আবার এখুনি বাড়ি কেন?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ি গেলে আর আসতে চাও না! জামাই চ'লে গিয়েছেন। মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু'তিন টাকা খরচ। তুমি মহল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ি হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে ব'ল বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়িতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ি আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নবেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই

কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে? পাঁচ ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নয়। সে যাক, কিন্তু সেই চার পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ি এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ি যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতেই হইবে। সে পলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ি থেকে, আবার এখুনি বাড়ি কেন?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ি গেলে আর আসতে চাও না! জামাই চ'লে গিয়েছেন। মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু'তিন টাকা খরচ। তুমি মহল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল,

তাহা একরূপ অসম্ভব। সে থাকে বাড়ির মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্ব্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মাসীমা, কোথায় গেলেন, ও মাসীমা?

ঝি বলিল, মা ওপরে পূজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বসলেন।

বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই। রাণাঘাটে হাসপাতালে যেতে হবে। একটা কথা ছিল, আচ্ছা, আর কেউ আছে? কথাটা না হয় ব'লে যেতাম।

—দিদিমণিকে ডেকে দোব? দিদিমণি রান্না-বাড়িতে রয়েছে, দেখব?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও, কথাটা ব'লেই যাই।

ঝি বাড়ির ভিতরে চালিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হ'ল। কর্ত্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

ঝি তখন রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো ঝি, ওপরে আমার ঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুণকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা এসেছ বাইরে? কই, আমি তো শুনি নি, চা খেয়েছ?

—না।

—তুমি কখন যাবে? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ি যাচ্ছ যে? বিপিন এদিকে ওদিকে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ৎ তোমার বাবার কাছে দিতে হয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি?

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমিও তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে? সে একবার কেবল বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। ব'স, আমি ক'রে আনি।

বিপিন রাজি হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এই অবেলায়! একটা কথা জিগ্যেস করি— যদি আমার আসতে দু এক দিন দেরি হয় কর্ত্তাবাবুকে ব'লে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের স্বরে বলিল, নির্ভয়ে চ'লে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, তিন দিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এস। বাবাকে শান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ডরাই? চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না। কোন্ সকালে ধোপাখালি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল

এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এস, ব'স উঠে।—বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনেও হয় নাই। সেদিন সে সে ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরি দেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা ক'রে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়িতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নী! মানী বেচারী হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি, এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে আবার দুইখানা থিন্ এরারুট-বিস্কুট—তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল। কোথা হইতে নারিকেল মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও, একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুঁজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়ে মাখ না।

আস্তে আস্তে ব'সে খাও, আবার কখন খাবে, তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকে দেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও তৃপ্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না, তাহা নয়। সে অন্য ধরণের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ির কৃষাণের দিকে পর্য্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোন দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, খুড়ীমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এস। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে ?

—দুমাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বাহাল রইল ?

বাঃ রে, আমি বলেছি তিন দিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধর দশ দিন।

—না হয় ধর এক মাস।

—না হয় ধর তিন মাস ? সে সব হবে না, সোজা কথা শোন বিপিনদা! আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, কদিনে আসবে। না,

সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে ?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হ্যাঁ, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমার ভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হ'লে ? বেশ, এখন এস তা হ'লে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারী ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জমিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার! দেনা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবার সময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যাণ্ড্‌নোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকরিতে ভর্তি হইবার পূর্ব্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারী নীলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয় সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখও হইল। বেচারী মানী!

২

রাণাঘাট হাসপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য। হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে ?

বিপিন কৈবর্তের মেয়ে সেই নার্সটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ি যেতে চাইছে কান্নাকাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি ?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন ক'রে তুলেছে বাড়ি যাব বাড়ি যাব ক'রে। নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানে মিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে !

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না ?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটু সাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ি, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়া গিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চার সাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এস, আপনি কি বলছেন ?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোর দিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ নম্বর ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ি যাবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোক্‌রা রুগী। নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে?

—সে পূর্ব্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভালভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাব।

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন? আমার বাড়িতে থাকুন। আমার এখানে ডিনার খাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ!

—আমার এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাঁদের বাড়ি ব'লে এসেছি, সেখানেই থাকব। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয়—কুড়ি একুশ। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেত-খামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারের ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল, দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠাল-বাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে এক জোড়া

বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ি চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিস-পত্র গাড়ি বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারী লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ যদু মুস্তফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি কর?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হ'ল? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি? কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট দশ গাড়ি বালি বয়েছ নদীর ঘাট থেকে সারাদিন। এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরণের ছেলে। বয়সে বড় ভারিক্কি মুস্তফি মহাশয়কে তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে পর্য্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ক করিবে! তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা বিক্রি করছে আর মৌরসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখে নি—সব নেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচব, বলুন তো? এতে তবুও দিন এক টাকা গড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ি ছ আনা ক'রে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্য্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এগারো গাড়ি বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্যভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দ্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত। বলাই গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি করিয়া লাঙল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং

সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ বত্রিশ টাকা লাভ করিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা বাগদী-পাড়ায় নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধান রাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমির ধান এমন কি হবে যে, যার জন্যে অত বড় গোলার দরকার। দামও তো বেশি চাইবে।

বলাই বলিয়াছিল, বারণ ক'র না দাদা। বড় গোলাটা বাড়ি থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে, ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর! ওটাই আনি, কি বল দাদা?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিন দেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামের অনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ, তাহার উপর অনেকদিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরে আজ দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়িতে উঠিয়া একবার এ জানালায় একবার ও জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কত কাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে। নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল।

এখন না জানি কত বড় হইয়াছে। ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে গাঙের ধারে কদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে এবং তাহাতে শসা বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কাপালীপাড়ায় রাইচরণের পিসীর কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হ'লে আমাদের সূর্য্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখ নি সে ঝাল, রাঙা টুকটুক করছে, এক একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জান? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেব আমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে? সে নিজে বিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভানু, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ। গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্ত্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলা ছিল বাড়িতে, আজকাল দুটো লক্ষীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না!

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনরো হাতের বেড়, সে গোলা বাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

৩

বেলা এগারোটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ি পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ি আসিবার কোন সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষত বলাইকে আসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভানু, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ির তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকী! বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মত।

ভানু টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপরে পড়িয়া তাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হ'লে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব? এলাম তো চ'লে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ি নিয়ে যাও, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতে পারে! ছেলেমানুষ, তাতে ওর প্রাণ প'ড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁ গা, অসুখ কেমন? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না। মাকে ব'লে দিও, যেন যা তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

—তবেই হয়েছে। যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। আর কি জান, বাড়ি এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারা যাবে? তুমি যে কদিন বাড়ি আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসি কাটিয়ে ভাগাভাগি ক'রে বিলি ক'রে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে।

—না না, তা হ'তে দিও না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার দাদাকে চিঠি লিখব, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না।—বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাকে উলোর পিসীমা নিয়ে গেছেন আজ দিন পনরো হ'ল। তিনি এসেছিলেন গঙ্গাচ্চান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তাঁর সংসারে দাসীবৃত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো কর না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমি চ'লে গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না। একদিন এমন হ'ল—দুটিখানি পান্তাভাত ছিল, ভানু-টুনকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস ক'রে রইলাম। কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললুম, উপোস ক'রে মরি

সেও ভাল, কারও বাড়ি, কি রায়গিন্নীর কাছে, কি তুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেও কিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়িতে পা দিয়াছে, অমনই সতরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়া মনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরণের তিরস্কার। সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে দিয়া বাড়ির বাহির হয় নাই? স্ত্রীর মুখে তিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল। স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না? স্বামীর অক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না?

৪

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেল্‌তা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এক কাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ি ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তর-তন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ির সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা ঘুনির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন বাবাঠাকুর, আসুন, কবে এলেন বাড়ি?

এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষণও বিনি কাজে থাকতে দেখি না? চোখে ঠাওর হয়?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা চশমা এনে দিতি পার? চশমা ন'লি আর চকি ভাল ঠাওর পাই নে ঝে!

—বয়েস তোমার তো কম হ'ল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বল!

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাৎলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব ক'রে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাহাই বলে। আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে কেটে নব্বই বিরেনব্বুই। একশো! বললেই হ'ল বুঝি।

মাৎলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পড়িল। বলিল, চাচা, তুমি অনেক রকম মন্তর-তন্তর জান, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন।

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশবার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া। আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, মন্তর? তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপমার আশীর্ব্বাদে মন্তর সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা ব'লে কি হবে, এদিগরের কোন্ লোকটা জানে না আমার নাম? তবে এই শোন। শন্যভরে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডু জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায়

এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেক কথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে! এইজন্যই সে বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষে তাহা অতীত কালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই। নাই বলিয়াই তাহা রহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড শোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা কর বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এই শোনবা? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকা ক'রে 'পেন্সিল খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনের কথা।

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বল তো শুনি? মনে আছে?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল! কবিতা শোনবা? রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ ছিল। এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর? এই শোন—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥

গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকু বুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরের কবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনিনি তো চাচা? রামায়ণ-মহাভারতের কবিতাই তো বল। এ কোথায় শিখলে?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল যে! বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হ'ত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী কজন পরামর্শ ক'রে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিওয়ালার বই। বড় ভাল লেগে গেল। তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পান চাচা?

—বড্ড হে-পানা; আপনাদের কাছে আর বলব? ছেলেছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হতি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে ব'লে এক রাজকন্তে, তার সঙ্গে সুন্দর ব'লে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। প'ড়ে দেখো। বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিণোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

কিছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভূরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে॥

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন।

বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, কারণ সে সাহিত্য-রসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনও বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তো নয়—মানী। কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছে আসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা, তাহার চেয়েও অনেক ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহার চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ির পশ্চিমে বেল্‌তার মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও ছাতারে পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি দেখিতে

পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মানীর গত কয়দিনের কার্য্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে?

কেহই নয়, অথচ সেই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে? ইচ্ছা করিলেই কি তাহার সঙ্গে যখন তখন দেখা করিবার উপায় আছে?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল!

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্ষ্যাতে আমার নাতি ব'সে পাখী তাড়াচ্চে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারই কুমড়োর ভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলার আধশুকনো ঘাসের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুইপাখী তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশে মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে

নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিক বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পুবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হাদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! সুমুন্দির পাখীগুনো তো বড্ড জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার নয়ান ছুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে, বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরণে উড্ডীয়মান বাবুইপাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে শোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর

জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্ব্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহার মনের যতটা কাছে, অতটা কেহ কখনও আসে নাই! বিপিন লেখা-পড়া মোটামুটি জানিলেও এমন কিছু বেশী নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?

হয়তো হইবে।

যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।

সে মেজ ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতার মাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেই হেড-মাস্টারের কাজ করে। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না।—বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

। তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ি গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্ত্তমানে কর্ম্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্ম্মকারের পোড়ো বাড়িতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির জোগাড় করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপ্‌নে যে! আয় আয়, ব'স। কবে এলি রে বাড়িতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি

করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণ জয়কৃষ্ণ স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীই উপরওয়ালা হেড-মাস্টারের এক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরে সে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার স্বর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ও বিপিনবাবু?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি। কোন মেয়েমানুষের কথা তো? বলুন না, একটু শুনি। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে বলছি।

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে সুরু করিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম বিজলী। তাহার বাবা ও

মায়ের সঙ্গে সে কলিকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায় মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত। একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায়?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাসে মাসে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্ন করে।

—কি রকম যত্ন করে?

এই, গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্ন আর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সে সব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সে কথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখন কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আনমনেই বলিল, আমাদের এ রকম কখনও কেউ চিঠি লেখে নি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোন মেয়ে কিছু বলেও নি, সাহস ক'রে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারি নি মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়েস হ'ল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি ক'রে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ি মানুষ হয়েছি দুঃখে কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখি নি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি ক'রে হাট বাজার ক'রে অতিকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, একটা ভাল কথা কখনও কেউ বলে নি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিই নি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এমন হতাশ সুরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূর হইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর তাহার যেন একটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্দ্ধ-পরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী যেন তাহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের সমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড় ধনী।

২

বাড়িতে আসিয়া প্রথম দিন পাঁচ ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়িতে বসিয়া আছে! নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটা হবে। সাত আনা ক'রে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ি থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বৌদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংস খাওয়া কেহ বন্ধ কারতে পারিল না!

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াও বাড়ি আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ি আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ

হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ির সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনের কানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন একদিন বাড়ি থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য সুরু করিয়া দিল। কখনও লুকাইয়া, কখনও বা বাড়ির লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এই ভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাঁচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিল। তাহার বাড়ি আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়া ছাইয়া লইবে! এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।

বাড়ি আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ি আসিবার আনন্দ উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়ের পাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্য মনের আনন্দে নির্ব্বিচারে পথ্য অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থা দেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে! সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালে সেবার লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যা চেহারা ছিল, তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো যুগীপাড়া থেকে আর দুখানা ছিপ নিয়ে আসি।

বলাই উঠিয়া হাঁটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ির লোকে

হয়তো ভাবে, তবে অসুখ এমন কঠিন আর কি! "কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবং উত্থানশক্তিরহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মত বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।"

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দাম বড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই, একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আর মাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছে জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি ক'রে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে।

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়েরই ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে!

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতূহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছপালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিক এপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনও কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমন ভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন ক'রে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না, কিছুই না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বা করিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনে ভাবিল, কিছু না, এমনই চেয়ে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে একবার চোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে!

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? কি দেখছিস বল তো?

বলাই বলিল, না কিছু দেখছি না। এমনিই।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটা ঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপ গাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমুল শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্য্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানে তাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বনে সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদ-পোড়া ফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিন ভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাইবে!

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই; সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন ক'রে? ওদিকে তাকাস নি।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ও ফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও! সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চল, বাড়ি চল। সন্ধ্যে হ'ল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

অসুস্থ ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হাল্কা ছিল, সর্ব্বদা যেমন কি এক ধরণের আনন্দে ভরপূর ছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠুরির মেঝেতে সিমেণ্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহু-কাল। জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাটের পিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে এক গাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরোনো হুঁকো, একটা পুরোনো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ব্ববৎসর দারিদ্র্যের দায়ে বিপিন সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তাপোষ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়িবার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকীকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরোনো তুলো-বার-হাওয়া তোষক পাতিয়া বিপিনের জন্য বিছানা করা হইয়াছে। মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনদিন হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, যাহা হইতে সংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সাঁজাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন সৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপর বিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির সুরে বলিল, এত রাত পর্য্যন্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে ? বলি এখানে মানুষ শোবে, না এটা গোয়াল ? নিয়ে যাও সরিয়ে।

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল। ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে, দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে, না আছে, এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া ক'রে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে ?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিবাদের হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটা ব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকরি হইবার পর হইতেই স্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানা রকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত; বিষয়আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগিত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ। না করিলেও দোষ। বিপিন যেন তাহার সব কিছুতেই দোষ দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহা মনোরমা ভাবিয়া পায় না।

৩

মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এই সংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ শ্বশুর-বাড়িতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে, তাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমার নিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন তখন ছুতা-নাতায় এ বাড়িতে যাতায়াত করে এবং বীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহরবাজারের মেয়ে, তাহার বাপের বাড়িতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপ হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়িতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়িতে তত আসিতে দেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয় সাত মাস বাড়াবাড়ি। বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো

পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনও না কোনও ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই। এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ী সন্ধ্যার পর ভাল চোখে দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই আসিবে ওই পোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!

বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়, ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ বত্রিশ কি তারও বেশি; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে এত কথাবার্ত্তাই বা তাহার কিসের? বিশেষ যখন বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না। বলাই তো এতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ী চোখে দেখেন না, তাঁহার থাকা না থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোন লাভ নাই। মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে। বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়ীকে বলিয়াও কোন লাভ নাই। তিনি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিরেট ভালমানুষ, তাঁহার কথা

ঠাকুরঝি শুনিবেও না। বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ী বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপিনকে কথাটা বলিবার! কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেন সর্ব্বদাই চটা, এ কথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে!

মনোরমা সংসারী ধরণের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে। জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়িতে, তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামী বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেউ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখন এখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাই জ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ি যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই! সবই তাহার অদৃষ্ট।

শাশুড়ীর বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে তাপ-সেক করিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ীর সেবা বরে, বীণার

নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না ; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা নিজের ধরণে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়া কখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই ; মনেপ্রাণে সে যেন এখনও অবিবাহিতা বালিকা। তাহার ধরণধারণ বালিকার মতই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরণের মেয়ে সে কোনও কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট্ট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনের শূন্যস্থান তিনি কোন কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না ; এখনও সে ছেলেমানুষ, ঠিকমত হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকে চাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামীপুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে, তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধূ ধূ মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনই ভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ি হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড় শো টাকা! বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেই সঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলে পরামর্শ দিল, জমি এখনও

যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনা হইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু ক'রে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।

বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোন একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে। আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড়শো টাকা নিলে আর উপুড় হাত করলে না, আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষে ওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনও ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওই হারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিস নি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি, হার দরকার হয় নাও না, তবে ব'লে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা ছিল, অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চ'লে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বউদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকা ক'রে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুর গাড়ি নিজে হাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দ্দশার সংসারে বীণা পেট ই ভরিয়া খাতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরে, রাত্রে এক মুঠা চালভাজা চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায় পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায় বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সেই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয় তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা।

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়া শুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধ ঘণ্টাটাক পড়িয়া শুনাইবার পরে বই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আজকাল বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্য্যন্ত, রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়তি এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার

যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুস্কিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায়, তাহাতে সব দিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সে দিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলটপালট হইয়া যাইবে মাঝে পাড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোন কথা লোকের কানে গেলে টি টি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি।

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল কি কথা ?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা তো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাকগে, কাল কি পরশু কি আর একদিন—, এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজ অন্তত দরকার নাই।